

# মায়হাব বুঝার সরল পথ

(تقلید پر غور کرنے کا سیدھا راستہ)

মূলঃ

মাওলানা ইয়াহইয়া নুমানী

অনুবাদক:

মাওলানা মাহমুদ হাসান মাসরুর

শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দিলুরোড ঢাকা  
খতিব, মসজিদে আয়েশা, মালিবাগ ডি আই টি রোড ঢাকা

সম্পাদক:

মাওলানা আবু সাবের আবদুল্লাহ  
উস্তাজুল হাদীস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা

প্রকাশনায়ঃ

ইসলামিক দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন একাডেমি (আইডিয়া)

সংগ্রহেঃ আসহাবুস সুফফা বাংলাদেশ

## কিছু কথা

আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত ধর্ম হল ইসলাম। শিক্ষিত,মূর্খ প্রত্যেকের জন্য এ জীবনব্যাবস্থা। আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে অনুসরণের পদ্ধতিকে সহজ করেছেন। একদল মুজতাহীদ গবেষণা করবেন আর অন্যরা তাদের থেকে দ্বীন শিখে নিবেন। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন – “ধর্মজ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বেরিয়ে পড়েনা, যেন ফিরে এসে স্বজাতিতে তারা সতর্ক করতে পারে।”(সূরা তাওবাহ-১২৩)

পরবর্তীতে হাদীস ও কোরআন থেকে মাসআলা নেওয়ার জন্য আলেমগণ হুজুতের ভিত্তিতে কিছু নিতীমালা ঠিক করেন। ইমাম আবু হানীফা রাহঃ এর ফিকাহ বোর্ডের সেই নিতীমালা অনুযায়ী যে সকল মাসআলা সংকলন করা হয়েছে সেগুলোকে একত্রে মাযহাবে হানাফী বলা হয়। ঠিক একইভাবে মাযহাবে মালেকী, মাযহাবে শাফীয়া, মাযহাবে হাম্বলী সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি মাযহাবের প্রতিটি মাসআলার পিছনে রয়েছে শরঈ হুজুত বা দলিল। বিভিন্ন এলাকায় এ চার মাযহাবের মধ্যে কোন না কোন এক মাযহাবের প্রসার ঘটেছে। এবং সেখানে ঐ নির্দৃষ্ট মাযহাবের মুজতাহীদ আলেম থাকায় সাধারণ মানুষ তাদের থেকে মাসআলা জেনে নিতে পারেন। দ্বীন মানার এ পদ্ধতি হাজার বছরের বেশী সময় থেকে চলে আসছে এবং সাহাবীদের মধ্যেও তাকলিদের এ পদ্ধতি বিদ্যমান ছিলো। অর্থাৎ মুজতাহীদদের থেকে মুকাল্লিদরা শিখে নিবেন।

কিন্তু বর্তমানে জামায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ফেরকার জন্ম হয়েছে। তাদের একটা স্লোগান হল মাযহাব, তাকলীদ এগুলো শির্ক এবং বর্জনীয়। মানতে হবে সরাসরী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামকে। এদের এ স্লোগানের আসল হাকীকত হল আলী রাযিঃ এর একটি কথা – “কথা সত্য মতলব খারাপ”। এ ফেরকার লোকেরা সাধারণ মানুষকে বুঝাচ্ছেন মাযহাব মানে হল ধর্ম। হানাফী মাযহাব হল হানাফী ধর্ম। অর্থাৎ হানাফী মাযহাব মানা হল রাসূলের কথাকে উপেক্ষা করে ইমাম আবু হানীফার কথা মানা। (নাউযুবিল্লাহ)। এরা আবার বলে মাযহাবের মাসআলার বিপরীতে সহীহ হাদীস পেশ করতে পারলে আপনি কেন মাযহাব মানবেন। অর্থাৎ তাদের কথা থেকে বুঝা যায় যে মাযহাবের মাসআলা হল ইমামের মত, কোরআন হাদীস না। কিন্তু এ আহ্বানকরা কি এটা জানে না যে ইমামগণ কোরআন হাদীস থেকেই এ মাসআলা সংকলন করেছেন? এবং সেগুলো উসূলের ভিত্তিতে তাদের পেশকৃত দলিল থেকে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য।

এ ধরনের আরো অনেক প্রশ্ন করে থাকে আহলুল বিদায়া ওয়াল ফিরকার এ সকল ভায়েরা। মাযহাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে তাদের এ সকল মতলবী কথার দ্বারা অনেকেরই ধোঁকা খেয়ে যাবে। এজন্য অল্প কালেকরে কিন্তু ব্যাপকভাবে জানার জন্য মাযহাব সম্পর্কে এক অসাধারণ কিতাব এটি। এর আগেও আমরা আইডিয়া পাবলিকেশন থেকে মাযহাব সম্পর্কে একটি গবেষণা গ্রন্থ বের করেছি। সেটি হল – “মাযহাব প্রসঙ্গে ডাঃ জাকির নায়েক”। আল্লাহ তায়ালা লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক সহ যারা এ কিতাবটি প্রস্তুত করেছেন সকলের মেহনতকে কবুল করেন-আমিন।

আহনাফ বিন আলী আহমাদ

(আইডিয়া পাবলিকেশনের পক্ষে)

(আইডিয়া পাবলিকেশন-০১৯২০৯৬১৬৩৪)

## পূর্বকথা

(মূল লেখক মাওলানা ইয়াহইয়া নুমানীর ভূমিকা অবলম্বনে)

আমরা সবাই জানি, বিগত কয়েক দশক যাবৎ ধর্মীয় জ্ঞানে অনগ্রসর, সরলমনা সাধারণ মানুষকে তাকলীদ ও মাযহাব ত্যাগ করে ‘লা-মাযহাবী’ পন্থায় কোরআন-হাদীস অনুসরণের জোরদার আহ্বান জানানো হচ্ছে। যা মুসলমানদের মাঝে নতুন একটা ফেতনা ও বিশৃংখলার জন্ম দিয়েছে এবং ক্রমেই তা পারস্পরিক অনাস্থা-অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে চরম ধর্ম-সামাজিক অরাজকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে! গ্রামে-গঞ্জে পাড়ায়-মহল্লায়, এমনকি মসজিদে মসজিদে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠছে। একপেশে মনোভাবের কিছু লোক এই বলে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, ‘মাযহাব মানা হারাম বরং শিরক! মাযহাবের অনুসারী সকল মুসলমান কাফের ও মুশরিক!’

বিশ্বের প্রায় সকল মুসলমান হাজার বছর ধরে যে চার মাযহাব মোতাবেক কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করে আসছে, সেই চার মাযহাবকে তারা সম্পূর্ণ বাতিল আখ্যা দিয়ে ভীষণ অস্থিরতা সৃষ্টির পায়তারা চালাচ্ছে। পুস্তিকা বিতরণ, লিফলেটবাজি, টেলিভিশন চ্যানেল, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে মারাত্মক ধরনের অন্তর্ঘাতী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং যুবকদের টার্গেট করে করে ঐ বিদ্বেষপূর্ণ মতবাদে রিক্রুট করছে।

এ মতবাদে আক্রান্তরা আগের-পরের দেশের-বিদেশের সকল আলেম-উলামাকে পথভ্রষ্ট বলতে একটুও দ্বিধা করে না। যে কোনো ইতিবাচক ধর্মীয় কাজে বাধা সৃষ্টি করতে তারা মোটেও পিছপা হয় না। এই সমস্ত লোকের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে প্রাচীনকালের খারেজী সম্প্রদায়ের চরিত্রই দিনদিন পরিস্ফুট হচ্ছে। যা মুসলিম-সমাজের জন্য অতি ভয়ংকর এক অশনি সংকেত। এ জন্য আলেম-উলামা তো বটেই, অভিভাবক শ্রেণীর সাধারণ মানুষও অত্যন্ত দুর্গণিত ও চিন্তিত। এমতাবস্থায় মাযহাব-প্রসঙ্গ সহজে বোঝার এবং বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে বক্ষমান পুস্তিকা সাধারণ পাঠকের জন্য খুবই উপকারী হবে বলে আশা করি।

মূল কিতাব হলো ভারতের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানী রহ.-এর দৌহিত্র মাওলানা ইয়াহইয়া নুমানীর একটি ওজস্বী কিতাব *اختلاف کی حقیقت اور مسلکی تقلید* (মাযহাব ও ইমামগণের ইখতিলাফের মূল রহস্য)-এর সারসংক্ষেপ। মাওলানা নিজেই নিজের এ-কিতাবের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেছেন এবং নাম দিয়েছেন *سیدھا راستہ* (মাযহাব বুঝার সরল পথ)। উভয় কিতাব সকলের সংগ্রহে রাখার মতো। প্রথমোক্ত কিতাবে চারটি মৌলিক বিষয় দালিলিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে,

- ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব মানাই (দলিল-নির্ভর মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলায় নির্দিষ্ট ইমামের ব্যাখ্যা মেনে চলাই) দ্বীনের উপর আমল করার স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতি। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।
- উপরোক্ত কারণে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমবিশ্ব মাযহাবের ব্যাখ্যা মোতাবেক কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করে আসছে।

- উম্মতের গ্রহণযোগ্য সমস্ত আলেম ও মুহাদ্দিস চার মাযহাবের কোনো না কোনো মাযহাব মোতাবেক দ্বীনের উপর আমল করে গেছেন।
- ইমামগণের ইখতেলাফের (মতপার্থক্যের) যৌক্তিক কারণসমূহের একটি কারণ খোদ কোরআন-হাদীস নিজেই। অর্থাৎ কোরআন-হাদীসের দলিলের মাঝেই একাধিক মতের অবকাশ নিহিত আছে। ফলে ঐ একাধিক মতের একটিকে হক বলে অন্যটিকে বাতিল আখ্যা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং শুধু এতটুকু যে, বিভিন্ন বিবেচনায় একটি কারো কাছে প্রাধান্যযোগ্য হবে, আরেকজনের কাছে হবে অন্যটি। সুতরাং এ জাতীয় ক্ষেত্রে নিজের মতকে সঠিক এবং অন্যমতকে সম্পূর্ণ ভুল আখ্যায়িত করা অন্ধআবেগ আর মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়।

স্নেহের পুত্র মাওলানা মাহমুদ হাসান মাসরুরের ইলমী-আমলী তরক্কীর জন্য সবার কাছে দোয়া চাই। আমার মনে হয়, তার ভাব-অনুবাদ মূল কিতাবের চেও সহজবোধ্য হয়েছে। পুস্তিকার শেষে একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। কম্পোজের কাজের পুরোটাই আঞ্জাম দিয়েছেন মাওলানা সিফাতুল হক বিন উবায়দুল হক। আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন, আমীন।

এই পুস্তিকার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের জন্য শিক্ষা ও সমাজ-সেবামূলক দ্বীনী সংগঠন ‘আসহাবুস সুফফা বাংলাদেশ’ উদ্যোগী হয়েছে। সকলের সুপরামর্শ ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। কেউ ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করতে চাইলে লেখক ও অনুবাদকের পক্ষ হতে সানন্দ অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সকলের সহায় হোন। আমীন।

বিনীত

আবু সাবের আব্দুল্লাহ

২/৬/১৫ ঈ.

## সূচিপত্র

জরুরী জ্ঞাতব্য -----	০৭
মূল আলোচনা -----	০৭
মাযহাব মানার অর্থ কী? -----	০৮
শরীয়তের বিধানাবলি দুই প্রকার -----	০৮
পূর্ববর্তীদের মাঝে দ্বিমতপূর্ণ মাসআলা দুইয়ের মূল অংশ নয় -----	১০
দ্বীনী ইলমে অনগ্রসরদের জন্য তাকলীদ জরুরি -----	১০
ইজতেহাদী মাসআলা পরিচিতি -----	১১
হাদীস না জানা ইখতেলাফের মূল কারণ নয় -----	১২
সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম তাকলীদ করতেন -----	১২
চার মাযহাব গঠনের প্রেক্ষাপট -----	১৩
সাহাবা-যুগে সুনির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ -----	১৩
প্রচলিত মাযহাব ব্যক্তিবিশেষের মতের সমষ্টি নয় -----	১৭
ইতিহাসের গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম তাকলীদ করতে বারণ করেননি -----	১৭
মাযহাব চারটি কেন? -----	১৮
মুহাদ্দিসগণের কর্মধারা ও মাযহাব -----	১৯
শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী ও তাঁর অনুসারীগণ -----	২১
আহলে হাদীস ভায়েরাও তাকলীদ করে! -----	২১
মাযহাব মানার শক্তিশালী দলিল -----	২২
নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের একটি রহস্য -----	২২
সাধারণ মানুষের উপর স্থানীয় আলেমদের তাকলীদ করা জরুরি -----	২২
আহলে-হাদীস ভাইদের আচরণ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? -----	২৩
আহলে-হাদীস ফেতনার বড় ক্ষতি -----	২৪
একটি দরদী আহ্বান -----	২৪
সাধারণ মুসলিম ভাই ও বোনদের প্রতি আহ্বান -----	২৫
আহলে হাদীস ভাইদের প্রতি আহ্বান -----	২৬
মসজিদের ইমাম ও খতিবগণের প্রতি বিনীত আবেদন -----	২৬

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আমরা জানি, মাযহাব মানার প্রসঙ্গ আজ বহু মানুষের সামনে অত্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বুঝের স্বল্পতা ও দ্বীনী ইলমে অপরিপক্বতার কারণে বহু লোক বিশেষত এক শ্রেণীর যুবক ভাই মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তারা নামাযসহ দ্বীনের অন্যান্য আমল কিভাবে কোন পদ্ধতিতে আদায় করবেন, এ নিয়ে দারুণ অস্বস্তিতে আছেন। একদিকে মাযহাব ত্যাগের দাওয়াত, অন্যদিকে দেশের সকল আলেম-উলামা মাযহাবের অনুসারী। সাধারণ মানুষকে তারা তদনোসারেই সালাত-সিয়াম শেখাচ্ছেন। আমাদের পরিবেশ হলো হানাফী মাযহাব মোতাবেক আমলের পরিবেশ। অথচ আমাদের বলা হচ্ছে,

- তোমরা যেভাবে নামায পড়, দ্বীনের অন্যান্য আমলগুলো যে তরিকায় আদায় কর, তা হাদীস-সম্মত নয়।
- তোমরা যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান এনেছো, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মান না কেন? মাযহাব কেন মান? ইমামের তাকলীদ কেন কর?
- তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের তরিকা না মেনে ইমামদের এত্তেবা (অনুসরণ) করে শিরকে লিপ্ত।
- বোখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাব বিদ্যমান। কিন্তু তোমাদের আলেমরা ঐগুলো ছেড়ে ফিকহের অনুসরণ করছে এবং তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। যদি তোমরা সহীহ দ্বীনের উপর আসতে চাও, মুক্তির পথে চলতে চাও, তবে সব মাযহাব ও ইমামের এত্তেবা ছেড়ে সরাসরি কোরআন-হাদীসের অনুসরণ করো।

এমতাবস্থায় যারা সাধাসিধা মুসলমান, দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে যাদের অবগতি দুঃখজনকভাবে দুর্বল, অনেক ক্ষেত্রে যারা নামাযটাও ঠিক মতো আদায় করতে পারে না, এমন সাধারণ মানুষ ও যুবসমাজ মারাত্মক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং অনাস্থার শিকার হয়ে পড়ে। কাকে বিশ্বাস করবে, কার কথা শুনবে, দ্বীন ও শরীয়তের উপর নিশ্চিন্তে কিভাবে আমল করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

ফলে শুরু হয় বাক-বিত-া, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের তুফান! একে অপরকে গোমরাহ আখ্যায়িত করার কদর্য মহড়া। শান্তিপূর্ণ সামাজিক সহাবস্থানের পরিবর্তে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার ক্লেদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। একান্ত নিরীহ ব্যক্তির ও এই কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি থেকে নিস্তার পায় না। ফলে আজ উম্মতের মাঝে বিভেদ-অনৈক্য মহামারি আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। অনাস্থা-অস্থিরতার কারণে মানুষের ঈমান-আমল সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং এখন প্রত্যেক মানুষকে সরলভাবে মাযহাব-প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য। তাহলেই তাদের অন্তরের অস্থিরতা দূর হবে। দ্বীনের উপর কিভাবে আমল করতে হবে তারা নিজেরাই তা উপলব্ধি করতে পারবে। বিভেদ-বিসম্বাদ ও অধার্মিকতার এ যুগে আত্ম-সংশোধন এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে তাক্বওয়ার যিন্দেগী গঠন করত দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে।

### জরুরী জ্ঞাতব্য

দ্বিমতপূর্ণ দ্বীনি মাসআলার ক্ষেত্রে দল পাকানোর চিন্তা কিংবা অন্যায় পক্ষপাতিত্বের মানসিকতা পরিহার করে চলা একান্ত আবশ্যিক। কারণ আমাদের আসল উদ্দেশ্য তো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য এবং দ্বীনের প্রতি কল্যাণ কামনা। অতএব আমরা কেবল সেই মত ও পথ অবলম্বন করবো, যাতে ইসলাম ও মুসলিমের কল্যাণ নিহিত।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মানুষ যদি প্রথমে একটি মত গ্রহণ করে নেয় এবং তার পক্ষে ওকালতি-প্রচারণা শুরু করে দেয়, তাহলে সে আর ঐ মতের ক্ষেত্রে মুক্তমনে, ইনসাফের সাথে এবং সত্যাস্থেয়ী হয়ে কোনো কিছু ভাবতে পারে না। তার অবস্থা হয়ে যায় আমাদের কালের গড়পড়তা উকিলদের মতো। যারা সত্য-মিথ্যা যাই হোক নিজের দাবী প্রমাণে এটা সেটা জোড়াতালি দিতেই থাকে। সত্যকে কখনোই মাথা পেতে নেয় না। তাদের উদ্দেশ্য সত্য নয়, কোনোভাবে মামলা জিতে নেওয়াই থাকে মূল লক্ষ্য। ঠিক তেমনি, আলোচ্য ব্যক্তি যদি তার মতের বিপক্ষে কোনো কথা শোনে, কোনো বই পড়ে, তবে এ নিয়তে শোনে ও পড়ে যে, এগুলোর জবাব দিতে হবে। এদিক সেদিকের কথা বলে হলেও এগুলো নাকচ করে দিতে হবে। এর ফলে লোকটি প্রকৃত সত্য অনুধাবনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

তাই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবো, এ-জাতীয় ভুল যেন আমাদের থেকে না হয়। আমরা খুবই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে, নেতিবাচক আবেগ ঝেড়ে ফেলে এই পুস্তিকাটি পড়বো। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ কামনাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য।

### মূল আলোচনা

প্রথমে মনে রাখতে হবে, তাকলীদ এবং মাযহাবগত বিভিন্নতার মাসআলা মূলত একটি শাস্ত্রীয় মাসআলা। আমি

تقليد اور مسلکی اختلاف کی حقیقت (মাযহাব ও ইমামগণের ইখতিলাফের মূল রহস্য)-নামক কিতাবে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয়ভাবে তফসিলি আলোচনা করেছি। কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের যথার্থ ও সরল পদ্ধতি হলো কোনো ইমামের তাকলীদ-এবিষয়ে দলিলসমৃদ্ধ বিস্তৃত আলোচনা ঐ কিতাবে রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’-এর সকল আলেম কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণের জন্য মাযহাব মানার এই পদ্ধতি সমর্থন করেছেন, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতা বিবেচনা করে এই পুস্তিকায় শাস্ত্রীয় আলোচনা পরিহার করা হয়েছে। এখানে অত্যন্ত সাদামাঠাভাবে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।



### মাযহাব মানার অর্থ কী?

আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আল্লাহ ও তার রাসূলকে ছেড়ে কোনো ইমামের এত্তেবা করার নাম মাযহাব নয়। ইমামের ব্যাখ্যা কোরআন-হাদীসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও তা মানতে হবে, এমন কথা কেউ বলে না। সুতরাং যারা বলে মাযহাব মানার অর্থ— ‘আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করা’— এটা মিথ্যা। অপবাদ আর প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

মাযহাব মানার অর্থ হলো, যে সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীসের দলিল অকাউ বা সুস্পষ্ট নয়, কিংবা দলিলগুলো পরস্পর বিরোধী বলে অনুমিত হয়, অথবা কোনো বিষয়ে সাহায্যে কেরামের যুগ থেকে উম্মতের আলেমগণের মাঝে একাধিক মত চলে আসছে, এবংবিধ ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষ নিজে নিজে অধিক সহীহ ও উত্তম মত নির্ণয় করতে অক্ষম হওয়ায় বরণ্য কোনো ইমামের বিশ্লেষণের উপর আস্থা রেখে আমল করার নামই হলো মাযহাব মানা বা তাকলীদ করা।

সুতরাং তাকলীদ মানে হলো শরীয়তের বিশেষ শ্রেণীর মাসআলার ক্ষেত্রে কোনো ইমামের ইলমের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা।

শরীয়তের বিশেষ শ্রেণীর মাসআলার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কেন একজন আলেমের তাকলীদ করে এবং কেন তারা নিজেরা দলিল বিশ্লেষণ করে সরাসরি কোরআন-হাদীসের উপর আমল করতে পারে না, তাও বুঝার বিষয়।

### শরীয়তের বিধানাবলি দুই প্রকার

১. কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশনা এতো পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন যে কেউ তা বুঝে নিতে সক্ষম। ঐ মাসআলাগুলোর দলিলে বাহ্যিক কোনো বিরোধও নেই। ফলে উম্মতের আলেমগণের মাঝে এ-সমস্ত মাসআলা নিয়ে বিশেষ কোনো মতপার্থক্যও নেই। (যেমন ঈমানের মূল বিষয়— তাওহীদ-রেসালাত-আখেরাত, মূল ইবাদত— পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত-রোজা, হজ্জ-কুরবানী, যিকির-দোয়া, মূল আখলাক— শোকর-সবর, তাকওয়া-তাহারাত, সততা-চারিত্রিক শুদ্ধতা ইত্যাদি) এ-জাতীয় মাসআলাগুলো দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক অংশ। এজন্য তাতে মতপার্থক্যের সুযোগই রাখা হয়নি। আর এ সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে তাকলীদও হয় না। সচরাচর দরকারও পড়ে না। প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণী থেকে তা উপলব্ধি করতে পারে।
২. কিন্তু কিছু বিধান এমন, যার দলিলে আল্লাহ ও তার রাসূল একাধিক সম্ভাবনার অবকাশ রেখে দিয়েছেন (বা হাদীস সহীহ না যদিও তা নির্ণয়ে দ্বিমত হয়ে গেছে)। অথবা দলিলগুলোর মাঝে বাহ্যিকভাবে বিরোধ-বিভিন্নতা ও অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, এমন মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণের মতামতও ভিন্নতর হয়ে গেছে। কিন্তু এ জাতীয় মাসআলা দ্বীন ও শরীয়তের বুনিয়াদি অংশ নয়। এ



কারণেই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ সমস্ত মাসআলায় ঐক্যমতে পৌছা সম্ভব হয়নি, (ঐক্যমতে পৌছার প্রয়োজনও নেই)।

তো এই দ্বিতীয় প্রকারের মাসআলার ক্ষেত্রে দলিল যেহেতু একাধিক সম্ভাবনাময় এবং একই কারণে আলেমগণের মাঝে মত পার্থক্যও আছে, সুতরাং কোরআন-হাদীসের গভীরতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত মানুষ অবগত নয়, তারা এ জাতীয় মাসআলায় কিভাবে আমল করবে? কিভাবে তারা কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করবে? তাদের জন্য স্বাভাবিকভাবে এতটুকুই সম্ভব যে, কোনো একজন ইমামের জ্ঞান-গভীরতা ও তাকওয়া-পরহেযগারির উপর আস্থা রেখে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মেনে দ্বীনের উপর চলবে।

আপনি ভেবে দেখুন, অধিকাংশ মুসলমান আরবি ভাষাটাও জানে না, কেউ কেউ আরবি ভাষা কোনো মতে জানলেও নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোরআন-হাদীসের ইলম অর্জন করেনি। সুতরাং তাদের জন্য ইখতেলাফী (মতপার্থক্যপূর্ণ) মাসআলার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের হুকুম মানার পথ একটাই— কোনো ইমামের উপর আস্থা রেখে তাঁর মত মেনে নেওয়া, তাছাড়া দোসরা কোনো পথ নেই। আর এরই নাম মাযহাব। এটাই হলো তাকলীদ।

এই সোজাসাপটা বিষয় নিয়ে যারা বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং বলে বেড়ায় ‘আমরা শুধু কোরআন-হাদীস মানি, মাযহাব মানি না। মাযহাব মানলে কোরআন-হাদীস মানা হয় না’— তারা আসলে মাযহাব মানা এবং তাকলীদ করার অর্থ বুঝতেই ব্যর্থ। অথবা তারা পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতা লালনকারী এবং উম্মতের মাঝে বিভেদকামী।

যাইহোক, ‘ইমাম মানবে না কোরআন-হাদীস মানবে’— মাসআলা আসলে এটা নয়। একজন মুসলমান তো কোরআন-সুন্নাহরই অনুসরণ করবে। কিন্তু যেখানে আমি সরাসরি কোরআন-সুন্নাহ থেকে শরঈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অক্ষম, সেখানে আমি কী করবো? আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এমন ব্যক্তিকে কী করতে হুকুম করেছেন, সাহাবায়ে কেরামই বা কী করতেন?

মূলত হানাফী-শাফেঈরা তো বটেই, যারা কোনো মাযহাব মানে না বলে দাবী করে, তারাও বিস্তৃত এমন ক্ষেত্রে তাদের কাছে যিনি নির্ভরযোগ্য এমন কোনো আলেমের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শরীয়তের উপর আমল করে থাকে। আর এটাই তাকলীদ, এর নামই মাযহাব মানা ও ইমামের ইত্তেবা করা! মাযহাবের অনুসারীগণ তাকলীদের এ-অর্থই গ্রহণ করে থাকেন। কেউ-ই এ-কথা বলেন না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণীর বিপরীত হলেও ইমামের বক্তব্য মান্য করা ফরজ ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব। বরং আলেমদের দৃষ্টিতে ইমামের বক্তব্য কোরআন-হাদীসের বিপরীত প্রমাণিত ও স্বীকৃত হলে ঐ ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা হারাম। ফিকহের মূলনীতি-গ্রন্থসমূহের সবগুলিতেই এই নীতির উল্লেখ আছে। অতএব তাকলীদ হবে শুধু সে সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে, যেখানে দলিলের আলোকে একাধিক মতের সম্ভাবনা রয়েছে, সাহাবা যুগ থেকে এ নিয়ে দ্বিমতও চলে আসছে, এমনতর ক্ষেত্রে গবেষণা করে একটি মতকে প্রাধান্য দেয়ার মতো গভীর ইলম ও তাকওয়া যাদের নেই, তাদের জন্য উপরোক্ত গুণসম্পন্ন কোনো ইমামের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমল করাই কুরআন-সুন্নাহর চিরাচরিত শ্বাশত নির্দেশ।

### পূর্ববর্তীদের মাঝে দ্বিমতপূর্ণ মাসআলা দ্বীনের মূল অংশ নয়

ইখতেলাফী (মতপার্থক্যপূর্ণ) মাসআলার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এ জাতীয় মাসআলা মতৈক্যপূর্ণ মাসআলার মতো দ্বীনের বুনিয়াদি স্তরে আসে না। এজন্য ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কেউ একটি মতগ্রহণ করলে তাকে কাফের-গোমরাহ বলার ন্যূনতম অবকাশ নেই। এবং সবাই একমত যে, এই মতভেদের কারণে কেউ ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’-এর গি-থেকে বের হয়ে যায় না। সুতরাং মত দেয়ার যোগ্য হয়ে আপনি একটি মত গ্রহণ করেছেন, তিনি গ্রহণ করেছেন অন্যমত। যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করে মত দিয়েছেন বলে আপনি যেমন হকের উপর আছেন, তিনিও আছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার রহ. (মৃত্যু:৭২৮হি.) মাযহাবপন্থী এবং মাযহাব-বিরোধী সবার নিকটই সমাদৃত এক মহা মণিষী। তিনি বলেন, ‘ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুজতাহিদকে (—শরঈ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুত্তাকী পরহেযগার আলেম, যিনি দলিলের ভিত্তিতে মাসআলা উদ্ভাবন ও মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দানে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে)—তার মত অনুযায়ী আমল করতে দেয়া হবে। এটা হলো সাহাবাগণের সর্বসম্মত আমল। যেমন ইবাদতের বিভিন্ন শাখাগত মাসআলা, তেমনি বিবাহ-তালাক, হেবা রাজনীতি ইত্যাদির শাখাগত বিষয়। আর সাহাবাগণের ব্যাপারে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তারা কখনো কোনো বাতিল বা গোমরাহির উপর একমত হবেন না। এবং কোরআন-সুন্নাহয় তাদের ইত্তেবা করার আদেশ রয়েছে।’ (মাজমুআতুল ফাতাওয়া ১৯/১২২)

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর উক্ত বক্তব্যের মতলব হলো, সাহাবায়ে কেরাম একমত যে, ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দলকে তাদের রায় মোতাবেক আমল করতে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে তাঁরা একমত ছিলেন। আর হাদীস অনুযায়ী সাহাবাগণ কোনো বিষয়ের উপর একমত হলে তা ভুল হতে পারে না। সুতরাং তাঁরা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, অর্থাৎ ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দলকে তাদের মত অনুসারে আমল করতে দেওয়া হবে, কাউকে গোমরাহ বলা যাবে না। আর এই সঠিক বিষয়ের অনুসরণ করা জরুরি। কারণ কোরআন-হাদীসে সাহাবীগণের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেমতে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে মাসআলা দ্বিমতপূর্ণ, সে মাসআলার ক্ষেত্রে একটি মত গ্রহণ করে অন্য সাহাবীর মতের অনুসারীদেরকে যারা হাদীস বিরোধী, গোমরাহ ইত্যাদি বলছে, তারা সাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে উম্মতের মাঝে ফেতনা ছড়াচ্ছে। আর যারা সকল মুজতাহিদ ইমাম ও তার অনুসারীদের মতের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করে, তারা সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

### দ্বীনী ইলমে অনগ্রসরদের জন্য তাকলীদ জরুরি

এতক্ষণে আপনি হয়ত বুঝতে পেরেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য কোনো ইমামের মাযহাব মানা জরুরি। তাদের জন্য ইখতেলাফি মাসআলার ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুসরণের এই একটিমাত্র পথই খোলা আছে। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। কেউ কেউ দুই চারটি চটি বই পড়েই নিজেকে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে মুজতাহিদ-স্তরে উঠে গেছেন বলে ভাবতে শুরু করেন এবং নিজেকে ইখতেলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়ার যোগ্য ভেবে অনায়াসে মাযহাব পরিত্যাগের মতো বোকামি করে বসেন। অথচ আলেমগণ এক এক

মাসআলার উপর বড় বড় কিতাব লিখে গেছেন। এগুলো বোঝার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে অভিজ্ঞ আলেমের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রে দীর্ঘ পড়াশোনা একান্ত জরুরি। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আজকালের আলেমগণের শতকরা দু'চার জনের পক্ষেও ঐসমস্ত কিতাব পড়ে বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বিষয়। এমতাবস্থায় যদি তাকলীদ করা হারাম বলা হয়, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানকেই এক একটি মাসআলায় সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য জীবনপাত করতে হবে। কারো পক্ষেই আর ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে থামার কিছুই করা সম্ভব হবে না। ১৫-২০ বছর লেগে যাবে প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করতে করতে। এরপর এক এক মাসআলায় সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য শত কিতাব পড়তে হবে।

এবার বলুন, আমরা যারা সাধারণ মুসলমান, আমাদের জন্য কি তা সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তবে তাকলীদ করা ছাড়া কোনো গতি কি আছে? সাহাবীগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছিলেন দ্বীনী ইলমে প্রাজ্ঞ। সারাদিন তারা শুধু ইলম চর্চা করতেন। অন্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন আর প্রথমোক্তদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে তাদের মাযহাব মতো আমল করে যেতেন। এটাইতো স্বাভাবিক নিয়ম!

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রহ. (মৃত্যু:৪৬৩হি.) লিখেছেন, 'ইজতেহাদী (একাধিক মতের সম্ভাবনাময়) মাসআলা সেগুলো, যেগুলোতে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য দলিল-বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবনের প্রয়োজন পড়ে। যেমন ইবাদত, লেনদেন, বিবাহশাদি ইত্যাদির শাখাগত মাসআলা। এ সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে তাকলীদ অনুমোদিত। দলিল হলো, আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা নিজেরা না জানলে আলেমকে জিজ্ঞেস কর।' (সূরা নাহল ১৬/৪৩) কেননা এ-জাতীয় শাখাগত মাসআলাতেও যদি তাকলীদ করতে নিষেধ করা হয়, তবে তো সাধারণ মানুষকে পরিপূর্ণরূপে শরীয়তের ইলম অর্জনে মশগুল হতে হবে এবং বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। (আর এর জন্য তো পুরো যিন্দেগী ওয়াক্ফ করে দিতে হয়!) তাহলে জীবন চলবে কিভাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে থামার সব তো বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এমন আদেশ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।' (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাফিহ ১/৪১৬)

### ইজতেহাদী মাসআলা পরিচিতি

কোন মাসআলাগুলো ইজতেহাদী, যাতে একাধিক মতের অবকাশ আছে, আমরা তা চিনবো কিভাবে? -এর সুনিশ্চিত আলামত হলো, 'পূর্ববর্তী ইমামগণের মতপার্থক্য হওয়া এবং ঐ বিষয়ে পরবর্তীতেও মতৈক্যে পৌঁছতে না পারা।' এবার আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি, সব ইমামের সব দলিল সামনে আসার পরও যেহেতু ঐ আল্লাহভীরু ইমামগণ যে যার মতের উপর অটল আছেন, এতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়, এই মাসআলাটি ইজতেহাদী। একারণেই তো সবাই সবার ইজতিহাদ দলিলসম্মত হবার ব্যাপারে আশ্বস্ত। একই কারণে কেউ কারো মতকে বাতিল বলে উড়িয়েও দিচ্ছেন না। আর এটাই হলো সাহাবায়ে কেরামের রীতি।

সুতরাং এই উম্মতের ইমামগণ পূর্ণমাত্রার খোদাভীতি ও জ্ঞান-গভীরতা সত্ত্বেও যখন কোনো একটি মাসআলায় একমত হতে না পারেন, বারবার একে অপরের দলিল সামনে রেখে চিন্তা-ফিকির করার পরও হাজার বছর যাবৎ সেই মতপার্থক্য থেকেই গেছে, তাহলে নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে, আসলে এ-মাসআলায় কোরআন-হাদীস মতেই দ্বিমতের অবকাশ আছে।

তো যার বিবেক আছে, ঠা-মাথায় চিন্তা করার মতো স্থিরতা যার আছে, যে দলবাজি ও পক্ষপাত-দোষ মুক্ত, সে নির্দিধায় স্বীকার করবে, এমনক্ষেত্রে আসলে উভয় মতই কোরআন-হাদীস সিদ্ধ। কিন্তু যার ভিতর ইনসাফ নেই, যে নিতান্ত বিবেকহীন, সে তো আরও সরল বাস্তবতাও অস্বীকার করে বসে। (আল্লাহ পাক সবাইকে এমন বিবেকশূণ্যতা থেকে হেফাজত করুন। আমীন)

### হাদীস না জানা ইখতেলাফের মূল কারণ নয়

আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, একটি দুনিয়াবি বিষয়ে পূর্ণ অবগতি সত্ত্বেও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়ই একমত হতে পারেন না। ইজতেহাদী মাসআলার ক্ষেত্রটিও অনুরূপ। চিন্তা ও বুঝের ভিন্নতার কারণে একটি মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের সকল শাখায় (কোরআন-হাদীসসহ যাবতীয় বিদ্যায়) পূর্ণ ব্যুৎপত্তি সত্ত্বেও দু'জন আলেম অনেক সময় একমত হতে পারেন না।

হতে পারে, কিছু মাসআলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস কোনো ইমামের নিকট পৌঁছেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে তো সবার সব দলিলই সবার সামনে এসে গেছে। কিতাব আকারে হাদীস সংকলিত হয়ে হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। প্রত্যেক মাযহাবের অসংখ্য আলেম স্ব স্ব মাযহাবের সঙ্গে অন্য মাযহাবের তুলনা করে দলিলসমৃদ্ধ কিতাব লিখেছেন, ইখতেলাফ তবু থেকে গেছে। (কারণ একাধিক সম্ভাবনাময় দলিলসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে দু'জনের দু'মত হতেই পারে।) বোঝা গেলো, কোরআন-হাদীসেই এই ইখতেলাফের অবকাশ রয়েছে। এর ফলে একটি মত যেমন সবার কাছে সন্দেহহীনভাবে সহীহ প্রমাণিত হয়নি তেমনি দ্বিতীয় মতও সবার কাছে সুস্পষ্টভাবে ভুল প্রমাণিত হয়নি। এজন্য এক ইমাম অন্য ইমামকে বিভ্রান্তও বলেননি।

### সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম তাকলীদ করতেন

আসলে কোরআন হাদীস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করা, মতভেদপূর্ণ ক্ষেত্রে মত প্রদান করা অনেক উচ্চস্তরের আলেমে দ্বীনের কাজ। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক বিশিষ্ট আলেমের পক্ষে ঐ স্তরে পৌঁছা সুকঠিন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তাকলীদ আমাদের জন্য জরুরি। আমাদের মতোদের জন্য তাকলীদ করতে অস্বীকার করা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

এজন্যই আমরা দেখি, সাহাবায়ে কেরামের যুগেই তাকলীদের প্রচলন হয়ে গেছে। সাধারণ সাহাবীরা এবং সেকালের অন্যান্যরা কোনো প্রাজ্ঞ সাহাবীর কাছে মাসআলা জানতে চাইতেন, তিনি দলিল উল্লেখ ব্যতীত মাসআলা বলে দিতেন। একজন সাধারণ ব্যক্তি নিজে ইজতিহাদী মাসআলা এবং তার লম্বা-চওড়া দলিল বুঝবে না বলে আলেমগণের উপর আস্থা রেখে শুধু মাসআলা জেনে নিতেন, দলিল তলব করতেন না। কোরআন-সুন্নাহর দলিলসম্মত কিন্তু দলিলের উল্লেখ ব্যতীত সাহাবায়ে কেরামকর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াসমূহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। বিশেষত ইমাম আবু হানীফকৃত 'কিতাবুল আ-হার,' ইমাম মালেককৃত 'আল-মোয়াত্তা', ইবনে আবি শায়বাকৃত 'আল-মুসান্নাফ' ইত্যাদিতে ফকীহ (শরঈ বিধিবিধান বর্ণনায় পারদর্শী) সাহাবীগণের মাযহাব ও মতামতসমূহ দলিলের উল্লেখ ছাড়াই বর্ণিত আছে।

তো দেখা যাচ্ছে, ঐ ফতোয়াসমূহের অধিকাংশের সঙ্গে দলিলের উল্লেখ নেই। প্রশংসারী ব্যক্তি ঐ সাহাবীর ইলমের উপর আস্থা রেখে আমল করেছেন। নিজে দলিল বুঝার বৃথা চেষ্টা করেননি। এটাই তো তাকলীদ!

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন হলেন আরবের একজন প্রসিদ্ধ আলেমে রব্বানী। শায়খ ইবনে বায রহ.-এর পরই যাকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। তিনি লিখেছেন,

‘বাস্তবতা হলো, সাহাবাযুগ থেকেই তাকলীদ বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরামের যুগে এবং আমাদের যুগে বিরাট সংখ্যক মানুষ এমন আছে, যারা নিজেরা কোরআন-হাদীস থেকে মাসআলা আহরণ করতে সক্ষম নয়। কারণ দ্বীনী ইলমে তাদের ঐ পরিমাণ দক্ষতা নেই। সুতরাং তাদের কাজ হলো আলেমদের জিজ্ঞেস করে আমল করা। আর এটাই হলো তাকলীদ। (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দরব ২/২২০)

### চার মাযহাব গঠনের প্রেক্ষাপট

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের পর যখন পৃথিবীর বহু অঞ্চল মুসলমানদের হস্তগত হয়, দূরদারাজ এলাকায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, তখন আলেম ও ফকীহ সাহাবীগণকে সে সমস্ত এলাকার মুসলমানদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য পাঠানো হয়। সেখানে তাঁরা নবীজীর সোহবত থেকে অর্জিত বুঝ-সমঝানুসারে কোরআন-হাদীস ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানুষকে দ্বীন শিখিয়েছেন।

পৃথিবীর সব মানুষই আপন আপন এলাকার মণিষীদের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এটা দুনিয়াবি ক্ষেত্রে যেমন স্বাভাবিক সত্য দ্বীনী ক্ষেত্রেও তাই। ফলে প্রত্যেক এলাকার (অধিকাংশ) আলেমের চিন্তাধারা ঐ এলাকার সাহাবীগণের চিন্তাধারার আদলে গড়ে উঠেছে। এবং হিজরী প্রথম শতকেই পৃথক পৃথক ফিকহী মাযহাব কায়ম হয়ে গেছে। যেমন তখন বলা হতো ‘মদীনার (সাহাবী ও আলেমেদের) মাযহাব’, ‘কূফার মাযহাব’, ‘মক্কার মাযহাব’, ‘শামের মাযহাব’ ইত্যাদি। আজ আমরা যে সমস্ত মাসআলায় ইখতেলাফ দেখতে পাই, তার অধিকাংশের মাঝে বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত সাহাবীদেরও ভিন্ন ভিন্ন রায় ছিলো। মূলত এভাবেই আলাদা আলাদা ফিকহী ঘরানার সূচনা হয়।

### সাহাবা-যুগে সুনির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ

হিজরী প্রথম শতকেই অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম জীবিত থাকতেই বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব পচলিত ছিলো। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. ‘ইকদুল জীদ’ নামক কিতাবে লিখেছেন, ‘সাহাবা-যুগেই এই ইতিবাচক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে, প্রত্যেক এলাকার লোকেরা তাদের এলাকার বড় আলেমের তাকলীদ করবেন এবং সে এলাকায় প্রচলিত মাযহাব মেনে চলবেন।’

শরীয়া বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও তার ইতিহাস সম্পর্কে যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে, তিনি অবশ্যই বিষয়টি স্বীকার করবেন। যেমন সহীহ বোখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, এক মাসআলায় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে



আব্বাস ও মদীনার অনুসৃত সাহাবী যায়েদ বিন সাবেতের মাঝে দ্বিমত ছিলো। ঘটনাক্রমে মদীনার লোকেরা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে ঐ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলেন। তো তিনি তাঁর মত অনুসারে জবাব দিলেন (সহীহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী নিজের মতের পক্ষে একটি হাদীসও বললেন।) কিন্তু মদীনাবাসী (সাহাবীরা) বললেন, ‘আমরা (চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত আমাদের আলেম) যায়েদের সিদ্ধান্ত ছেড়ে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি না।’ (সহীহ বোখারী, ১৭৫৮)

কারণ মদীনাবাসীর আস্থা বেশি ছিলো যায়েদ ইবনে সাবেতের উপর। তারা ভাবলেন, এ বিষয়ে যায়েদ বিন সাবেতের কাছে আরো মজবুত কোনো দলিল থাকতে পারে কিংবা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যে হাদীস বলেছেন, হযরত যায়েদ রা.-এর কাছে তার ভিন্ন কোনো সঠিক ব্যাখ্যা আছে। এজন্য ইবনে আব্বাস রা.-এর পেশকৃত হাদীস দেখার পরও তারা আগে নিজেদের আস্থার পাত্র যায়েদ ইবনে সাবেতের সঙ্গে যোগাযোগ করা আবশ্যিক মনে করেছেন। (নিজেরা আরবী ভাষাভাষী এমনকি সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও মাসআলার ক্ষেত্রে নিজের বুঝকে যথেষ্ট ভাবেননি। কিন্তু আমাদের কালে বহু ভাই নিয়মিত পড়াশোনা দূরের কথা আরবি ভাষাটাও জানেন না, বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ পড়েই নিজেকে হাদীসের ব্যাখ্যাতা হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন এবং জটিল-জটিল মাসআলায় মত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন না। এমনকি সমকালীন-পূর্ববর্তী সকল বড় বড় আলেমের প্রতি বিশোধগার করতেও লজ্জিত বোধ করেন না। আজ আমরা আমাদের লোকদের এমন বেবুঝ কর্মকাণ্ডে- বড় অসহায়! আল্লাহ সবাইকে বুঝ দান করুন। আমীন।) তারা জানতেন, মাসআলার দলিলের ক্ষেত্রে হাদীসের মাঝে বিভিন্নতা প্রায়ই দেখা যায়। হাদীস বুঝার ক্ষেত্রেও আলেমগণের মাঝে ইখতেলাফ হয়। সুতরাং তারা আগে যায়েদ ইবনে সাবেত রা.-এর কাছে গেলেন এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণিত হাদীসটি পেশ করলেন। অতপর যাচাই বাছায়ের পর ইবনে আব্বাস রা.-এর মতই সঠিক প্রমাণিত হলো। তখন তারা পূর্বের রায় প্রত্যাহার করে নিলেন।

তো বুঝা গেলো, মদীনাবাসী যায়েদ ইবনে সাবেত রা.-এর উপর আস্থা রেখে তাঁর মত অনুসারে আমল করতেন। অন্য কোনো মত ও দলিল সমানে আসলে তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত না নিয়ে যায়েদ বিন সাবেতের সামনে তা পেশ করতেন এবং তার সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। এজন্যই তারা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে বলেছিলেন, আমরা যায়েদের সিদ্ধান্ত ছেড়ে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি না। অর্থাৎ তারা কোরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে কেবল যায়েদ বিন সাবেতের তাকলীদ করতেন। দ্বীনের উপর আমল করার ক্ষেত্রে একমাত্র যায়েদ বিন সাবেত রা.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন।

হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত এ-জাতীয় অসংখ্য ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, পৃথক পৃথক মাযহাব ও তার অনুসরণ সাহাবাযুগেই বিদ্যমান ছিলো, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং মাযহাব-বিরোধী ভাইদের প্রতি অনুরোধ, আল্লাহর ওয়াস্তে সাধারণ মানুষকে এই বলে বিভ্রান্ত করবেন না যে, পৃথক পৃথক মাযহাবের অনুসরণ করা বিদআত কিংবা শিরক। কারণ তা সাহাবা, তাবেঈ (ঈমানের সাথে যারা সাহাবীকে দেখেছেন) এবং তাবে-তাবেঈর যুগে ছিলো না, পরে সৃষ্টি হয়েছে।

(প্রিয় পাঠক। আপনি ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন, মাযহাব আগ থেকেই ছিলো। ছিলো না শুধু হানাফী মালেকী ইত্যাদি নাম। যেমন হাদীস আগ থেকেই ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে নাম হয়েছে বোখারী-মুসলিমের হাদীস, তিরমিযীর হাদীস ইত্যাদি। তো নামের কারণে বোখারী মুসলিমের হাদীস যেমন বিদআত

হয়ে যায়নি, শুধু নামের কারণে হানাফী-মালেকী মাযহাবও বিদআত হবে না। কোনো জিনিসের বিচার তো হয় হাকীকত তথা সারবত্তা হিসাবে, নাম ও পরিভাষা হিসাবে নয়।)

এখানে আরও মনে রাখতে হবে, পৃথক পৃথক মাযহাবের অনুসরণ হবে ঐ সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে, যেগুলোর দলিলের মাঝেই ভিন্ন ভিন্ন মতের অবকাশ আছে, যেমনটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু যে সমস্ত মাসআলায় কোরআন-হাদীস অকাউ ও সুস্পষ্ট, তাতে কোনো মতেই মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়।

যাইহোক, সাহাবা-যুগ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের অনুসরণ জারি হয়ে গেলো। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ (কোরআন-সুন্নাহ ও জামাআতে সাহাবার অনুসারী) সকল আলেম কোরআন-হাদীস অনুসরণের এই স্বাভাবিক পদ্ধতি গ্রহণ কও নেন। খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি খলিফা হওয়ার আগে যখন মদিনার বিচারক ছিলেন, তখন মদিনার মাযহাব অনুসারে রায় দিতেন। আবার যখন শাম এলাকায় গমন করতেন, তখন তিনি তথাকার প্রচলিত মাযহাব অনুসারে বিচার করতেন। (সুনানে দারেমী ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

একবার আব্বাসী খলিফা মানসুর ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট দরখাস্ত করলেন, আমরা আপনার কিতাব ‘মোয়াত্তা’ মুসলিম-বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিই এবং সব মাযহাব ত্যাগ করে আপনার কিতাবে উল্লিখিত মাযহাব মোতাবেক আমল করার ফরমান জারি করি। ইমাম মালেক রহ. বললেন, ‘না না, এমনটা করতে যাবেন না। বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছে বিভিন্ন মাযহাব পৌঁছে গেছে। তাদের কাছে তাদের মতের পক্ষে হাদীসও পৌঁছেছে। আর মানুষকে তাদের আমল থেকে সরতে বলা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। সুতরাং যে এলাকার লোকেরা নিজেদের জন্য যে মাযহাব পছন্দ করে নিয়েছে, তাদেরকে তার উপরই থাকতে দিন।’

ইমাম মালেক রহ. আরো বলেছিলেন, ‘মারাকিশ-আন্দালুস (স্পেন) এলাকায় আমার মত ও মাযহাব ছড়িয়ে পড়েছে। শামে (সিরিয়াতে) আছেন ইমাম আওয়াঈ রহ.। আর ইরাকের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।’ (তারতীবুল মাদারিক ২/৭২)

ইমাম মালেক রহ.-এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, তার সময়ে (১৭৯ হিজরির আগ থেকে) একেক এলাকায় একেক মাযহাব প্রচলিত ছিলো। সিরিয়াবাসী ইমাম আওয়াঈ রহ.-এর তাকলীদ করতেন। স্পেনের আন্দালুসে ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাব অনুসৃত হতো। ইরাকের অধিবাসীগণ হানাফী মাযহাব মেনে চলতেন। আর উম্মতের সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, কোনো এলাকার লোকদেরকে তাদের এলাকার আলেমদের মাযহাব অনুসরণে বাধা দেওয়া যাবে না।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, ইমাম হুমাইদ রহ. উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (মৃত্যু ১০১ হি.) রহ.-এর নিকট গিয়ে বললেন, ‘এই যে ভিন্ন ভিন্ন মত চলে আসছে, এটা খতম করে দিয়ে একটি মাত্র ভিত্তির উপর সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা উচিত। উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. বললেন, ‘এটা আমার পছন্দ নয় যে, ফিকহী মাসআলায় মতপার্থক্য হবেই না।’ তিনি খেলাফতের সকল অঞ্চলে সরকারী ফরমান লিখে পাঠালেন, ‘প্রত্যেক এলাকার লোকেরা যেন তাদের এলাকার আলেম ও ফকীহদের মত অনুসারে ফায়সালা করে।’ (সুনানে দারেমী, হাদীস নং ৬৫২)



বাহ্যত বিশ্বের সকল মুসলমান সব বিষয়ে একমত হয়ে যাবে এর চে বড় সুচিন্তা আর কী হতে পারে! কিন্তু যারা শরঈ দলিলের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন, তারা জানেন এটা হবার নয়। এটা বরং আল্লাহপাকের করুণা-গুণের খেলাফ। কারণ শাখাগত বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক মতপার্থক্য কোনো বিরোধ-বিসম্বাদ নয়; বরং তা সুন্নাহর বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য। এর ফলে আমলের ক্ষেত্রে সহজতা সৃষ্টি হয়। মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই আলাদা আলাদা মাযহাব গঠন-পত্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। প্রত্যেক এলাকার লোকেরা সাধারণত তাদের এলাকার আলেম-উলামার মাযহাব অনুসরণ করতেন এবং এ বিষয়টি সকল সাহাবা-তাবেঈ অনুমোদন করতেন। এমনকি একজন মুজতাহিদ আলেমও আপন এলাকায় প্রচলিত আমলের বিপরীত কোনো মত সাধারণত প্রকাশ করতেন না। কেননা প্রচলিত আমলটি ভুল প্রমাণিত হয়নি, বরং তাও সুন্নাহসম্মত। দলিলের আলোকে উভয় মতের সম্ভাবনাই রয়েছে। সুতরাং নতুন ভিন্নমত প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি করা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। (ইমাম মালেক রহ.-এর বক্তব্য থেকে পাঠক বিষয়টি আগেই আঁচ করতে পেরেছেন। আর আমরা নিজেরা তো এর সবচে বড় ভুক্তভোগী!)

তো এভাবে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মাযহাব প্রচলিত ছিলো কিন্তু কোনোটাই গ্রন্থাকার সংকলিত ছিলো না। সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক এবং তাদের শাগরিদগণ আপন আপন এলাকার প্রচলিত পরিমার্জিত মাযহাব কিতাব আকারে সংকলন করেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. মূলত ইরাকে প্রচলিত মাযহাব সংকলন করেন। যেখানে ১৪শত সাহাবী বসবাস করতেন। আর ইমাম মালেক সংকলন করেন মদিনায় প্রচলিত মাযহাব। এরপর আসেন ইমাম শাফেঈ। যিনি ইমাম মালেক রহ.-এর শাগরিদ এবং হেজাজ (মক্কা-মদিনাসহ পুরো) এলাকার প্রতিনিধি। তিনি তার এলাকার অন্যান্য সাহাবী ও তাবেরের মত একত্রিত করেন। ফলে শাফেঈ মাযহাবের গোড়াপত্তন হয়। ফিকহে শাফেঈর ধারারই এক বড় ইমাম হলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.। তিনি ইমাম শাফেঈর সঙ্গে কিছু মাসআলায় দ্বিমত করেন। এর ফলে ভিন্ন একটি মাযহাবের সূচনা হয়। প্রথম দিকে এই টারটি মাযহাবের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে চলতো লাইস ইবনে সাআদ রহ.-এর মাযহাব। শামে চলতো ইমাম আওয়াঈ রহ.-এর মাযহাব। কোথাও চলতো ইমাম তাবারীর মাযহাব। কিন্তু চার মাযহাব ছাড়া বাকিগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এবং কারো কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই আল্লাহর ইচ্ছায় চার মাযহাব ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ তাদের মাযহাবের পক্ষে দলিলের কিতাব লিখেছেন। অন্য মাযহাবের দলিল নিয়ে চিন্তা করে তুলমামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কোনো মাসআলায় যদি নিশ্চিত হতে পারতেন যে, এটা ভুল বোঝাবুঝির কারণে হয়েছে, তবে সেই মাসআলায় আপন মত ত্যাগ করতেন। যদিও এমনটা করার প্রয়োজন খুব কমই হয়েছে। কারণ ইমামগণের মতপার্থক্য তো কোরআন-সুন্নাহর ইলম কম থাকার কারণে বা ভুল বুঝার কারণে হয়নি। বরং ইখতিলাফ হয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে কোরআন-সুন্নাহর ভিতরে ইখতিলাফের আবকাশ রেখে দেওয়ার কারণে। কিংবা ইখতিলাফ হয়েছে চিন্তার এ্যাসেলের ভিন্নতার কারণে। যেখানে উভয় এ্যাসেলই যৌক্তিক। মোটকথা এভাবেই চার মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে এবং হাজার বছর ধরে উম্মতের মাঝে অনুসৃত হয়ে আসছে।

### প্রচলিত মাযহাব ব্যক্তিবিশেষের মতের সমষ্টি নয়

চার মাযহাবের কোনোটাই নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির মতের সমষ্টির নাম নয়। বরং তার এলাকার পূর্ববর্তী ইমামগণের মতের সমষ্টি। এমনকি পরবর্তী আলেমগণও যাচাইবাছাই করে যখন আপন মাযহাবের মত দুর্বল মনে করেছেন, তখন অন্য মতের উপর ফতোয়া দিয়েছেন। এভাবে ঐ ফতোয়াটিই মাযহাবের অগ্রগণ্য মতের মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন হানাফী মাযহাবের অনেক মাসআলায় ইমাম আবু হানিফার মত অনুসারে ফতোয়া দেয়া হয় না, অন্য মত অনুসারে ফতোয়া দেয়া হয়।

সুতরাং একটি মাযহাবের অনুসরণ মানে এক ব্যক্তির অনুসরণ নয় (তাকলীদে শখসী নয়) বরং একটি ঘরানার বড় এক জামাতের অনুসরণ। যদিও মনে করা হয় এটা তাকলীদে শখসী (এক ব্যক্তির অনুসরণ)।

### ইতিহাসের গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম তাকলীদ করতে বারণ করেননি

তাকলীদ হলো এই উম্মতের ইজমাস (সর্বজনস্বীকৃত) মাসআলা। সুতরাং যে ব্যক্তি তাকলীদ অস্বীকার করে, সে এই উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন মত লালন করে। সাহাবাযুগ থেকে যে জিনিস হালাল হিসাবে চলে আসছে, সেই অকাউ হালালকে হারাম বলা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কী! তাকলীদ বিষয়ে ইনসাফের সাথে সিদ্ধান্তে † পৌছার জন্য এই একটি কথাই যথেষ্ট যে, উম্মতের গ্রহণযোগ্য সকল আলেম যে বিষয় হালাল হবার ব্যাপারে একমত, সেটি হারাম হতে পারে না। এমন বিষয় অস্বীকার করা বিকৃত-রুচির পরিচায়ক।

হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (মৃত্যু:২৩৩হি.) ছিলেন হানাফী। ইমাম মালেক (১৭৯ হি.) ও ইমাম আওযাঈ (মৃত্যু:১৫৭হি.)-এর জীবদ্দশাতেই তাদের মাযহাব সাধারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, তরজমায়ে ইমাম মালেক)।

তার মানে, সেই কবে থেকে মাযহাব একটি সুপরিচিত বিষয় চিন্তা করা যায়! ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব কারো পছন্দ হলে ঐ বিষয়ে আপত্তি করা অন্যের জন্য বৈধ নয়। যার কাছে শাফেঈ মাযহাব ভালো লাগে, সে মালেকী মাযহাব পছন্দ করে এমন কারো প্রতি আপত্তি করতে পারবে না। তেমনি যার কাছে হাম্বলী মাযহাব ভালো লাগলে সে শাফেঈ মাযহাব বা অন্য কোনো মাযহাবের অনুসারীর প্রতি আপত্তি রাখতে পারবে না। (মাজমুআতুল ফাতাওয়া ২০/২৯২)

অন্য এক প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেন, ‘মানুষের অবস্থা দুটি। হয় নিজে মুজতাহিদ হবে, নয়তো অন্য কারো তাকলীদ করবে। যদি কারো তাকলীদ করে, তবে প্রাথমিক যুগের কোনো ইমামের তাকলীদ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রাথমিক যুগ পরবর্তী যুগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’ (প্রাগুজ ২০/৯)

অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মত হলো, যে ব্যক্তি মুজতাহিদ নয়, তাকে তাকলীদ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী কালের যেমন তেমন কারো অনুসরণ না করে প্রাথমিক কালের কোনো ইমাম বিশেষত চার

ইমামের কোনো একজনকে অনুসরণ করবে। কারণ একমাত্র চার ইমামের মাযহাবই তফসিলিভাবে সংরক্ষিত আছে এবং এর উপর যুগ যুগ ধরে আলেমগণের যাচাইবাছাই চলে আসছে।

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর শাগরিদ ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর মতে তাকলীদ কারো জন্য জায়েয (অনুমোদিত) আর কারো জন্য ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়)। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়তের অনুসরণে একনিষ্ঠ, কিন্তু কিছু মাসআলা সে নিজে নিজে বের করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তার চে বড় † কোনো আলেমের তাকলীদ করবে, এটা প্রসংসাযোগ্য, নিন্দাযোগ্য কোনো বিষয় নয়। সে বরং এর জন্য সওয়াবের অধিকারী হবে, গোনাহগার হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তাকলীদে ওয়াজিব ও তাকলীদে জায়েয এর অধীনে আসবে ইনশাআল্লাহ।’ (ই’লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১৮৮)

প্রখ্যাত সৌদি আলেম শায়খ সালেহ আল ফাউযান লিখেছেন, ‘ভেবে দেখুন! মুহাদ্দিসগণের মাঝে এঁরা হলেন একেকজন বড় বড় ইমাম। এঁরা সবাই মাযহাব মানতেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম নববী ও ইবনে হাজার আসকালানী ছিলেন শাফেঈ মাযহাব ‡ বর অনুসারী। ইমাম তাহাবী হলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম ইবনু আদিল বার হলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী। (ইআনাতুল মুস্তাফীদ ১/১২)

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ও তার অনুসারীগণ বলতেন, ‘সাধারণ মানুষ চার ইমামের কোনো এক ইমামের মাযহাব মানতে বাধ্য বলে আমরা বিশ্বাস করি।’ (আদ-দুরারুস সানিয়াহ ১/২৭৭)

### মাযহাব চারটি কেন?

উপরের আলোচনা থেকে আশা করি তাকলীদের নির্দোষ মর্মটা বুঝে এসেছে এবং হয়তো এটাও অনুভব করতে পেরেছেন যে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করা ও মাযহাব মানা এক অপরিহার্য বাস্তবতা। আর এটা নতুন কিছু নয়, সাহাবায়ে কেরামই তাকলীদের সূচনা করে গেছেন।

(এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, মাযহাব চারটি কেন? আসলে মাযহাবের বিভিন্নতা সাহাবা-যুগ থেকেই ছিলো। এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাযহাব প্রচলিত ছিলো। তাই মাযহাব শুধু চারটি নয়, এই উম্মতের মাঝে বড় বড় মণিষী যেমন অনেক বিভিন্ন মাসআলায় মাযহাবও অনেক। তবে অধিকাংশ মণিষীর ঐ সকল মাযহাব সংকলিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছেনি কিংবা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আর চার ইমাম যেভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মূলনীতি ও শাখাগত মাসআলা বৃহদাকারে সংকলন করেছেন এবং তাদের অনুসারীগণ তা যাচাইবাছাই করেছেন, অন্যদের ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠেনি। ফলে অন্যান্য মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কুদরতিভাবে রয়ে গেছে কেবল চার মাযহাব। এজন্যই মাযহাব চারটি। তাছাড়া বিভিন্ন মাসআলায় সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে যতো বড় বড় মণিষীর মাযহাব রয়েছে, একান্ত বিচ্ছিন্ন মত না হলে তার সবই চার মাযহাবের ইমামগণের কেউ না কেউ গ্রহণ করে নিয়েছেন। সুতরাং চার মাযহাবের প্রতি বিদ্বিষ্ট

হয়ে পঞ্চম মাযহাব সৃষ্টি করতে চাওয়া ভুল। তেমনি চার মাযহাব ভেঙ্গে এক মাযহাব সৃষ্টির চেষ্টাও একটি অগভীর চিন্তার সাময়িক উন্মাদনা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ইচ্ছার বিপরীতে দিবাস্বপ্নমাত্র।)

### মুহাদ্দিসগণের কর্মধারা ও মাযহাব

হিজরি চতুর্থ শতক থেকে যত আলেম মুহাদ্দিস এই উন্মত্তের মাঝে পয়দা হয়েছেন, তাদের সকলে কোনো না কোনো মাযহাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কোরআন-হাদীসের অনুসরণে মাযহাব মানার পদ্ধতি সঠিক ও যথার্থ প্রমাণিত হবার জন্য এই এক দলিলই যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে, এই পদ্ধতির অনুসরণের মাঝে মানুষের দ্বীন ও ঈমান হেফাজতের রহস্য নিহিত। মাযহাবের অনুসারী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের একটি ক্ষুদ্র তালিকা নিম্নরূপ-

১. ইমাম মুযানী (মৃত্যু:২৬৪হি.)
২. মুহাদ্দিস আবু বকর খাল্লাল (মৃত্যু:৩১১হি.)
৩. ইবনুল মুনযির (মৃত্যু:৩১৮হি.)
৪. ইমাম তাহাবী (মৃত্যু:৩২১হি.)
৫. মুহাদ্দিস রামাহুরমুযী (মৃত্যু:৩৬০হি.)
৬. ইমাম দারাকুতনী (মৃত্যু:৩৮৫ হি.)
৭. ইমাম খাতাবী (মৃত্যু:৩৮৮হি.)
৮. মুহাদ্দিস আবু নুআইম (মৃত্যু:৪৩০হি.)
৯. ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু:৪৫৮হি.)
১০. ইমাম ইবনু আদিল বার (মৃত্যু:৪৬৩হি.)
১১. খতীব বাগদাদী (মৃত্যু:৪৬৩হি.)
১২. মুহাদ্দিস ইবনে মান্দাহ (মৃত্যু:৪৭৫হি.)
১৩. মুহাদ্দিস ইবনে মাকুলা (মৃত্যু:৪৭৫হি.)
১৪. ইমাম বাগাবী (মৃত্যু:৫১০হি.)
১৫. মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায (মৃত্যু:৫৪৪হি.)
১৬. মুহাদ্দিস ইবনে আসাকির (মৃত্যু:৫৭১হি.)

১৭. মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (মৃত্যু:৫৯৭হি.)
১৮. মুহাদ্দিস জিয়া আল মাকদিসী (মৃত্যু:৬৪৩হি.)
১৯. মুহাদ্দিস ইবনুল সালাহ (মৃত্যু:৬৪৩হি.)
২০. ইমাম মুনযিরী (মৃত্যু:৬৫৬ হি.)
২১. ইমাম নববী (মৃত্যু:৬৭৬হি.)
২২. ইমাম বারযালী (মৃত্যু:৭৩৯হি.)
২৩. ইমাম ইবনু আব্দিল হাদী (মৃত্যু:৭৪৪হি.)
২৪. খতীব তাবরীযী (মৃত্যু:৭৪৮হি.)
২৫. ইমাম যাহাবী (মৃত্যু:৭৪৮হি.)
২৬. মুহাদ্দিস তকী উদ্দীন সুবকী (মৃত্যু:৭৫৬ হি.)
২৭. ইমাম যাইলাঈ (মৃত্যু:৭৬২হি.)
২৮. মুহাদ্দিস তাজুদ্দীন সুবকী (মৃত্যু:৭৭১হি.)
২৯. মুহাদ্দিস ইবনে কাছীর (মৃত্যু:৭৭৪হি.)
৩০. মুহাদ্দিস ইবনে রজব (মৃত্যু:৭৯৫হি.)
৩১. ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী (মৃত্যু:৮০৬হি.)
৩২. মুহাদ্দিস ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যু:৮৫২হি.)
৩৩. মুহাদ্দিস সাখাবী (মৃত্যু:৯০২ হি.)
৩৪. মুহাদ্দিস সুয়ূতী (মৃত্যু:৯১১হি.)
৩৫. মুহাদ্দিস ইবনে হাজার হায়ছামী (মৃত্যু:৯৭৪হি.) –প্রমুখ এই উম্মাহর গর্বের ধন মুহাদ্দিসীনে কেরাম । এছাড়া আরও কতজনের নাম ইচ্ছা করলেই উল্লেখ করা যায় । যারা সকলে আপন আপন সময়ে হাদীসের ইমাম ছিলেন । এদের হাতেই হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র উন্নতি লাভ করেছে । আর এরা সকলে ছিলেন মাযহাবপন্থী । সুতরাং মুহাদ্দিসীনে কেরামের কর্মপন্থা হলো মাযহাব অনুসরণ, বিরোধিতা নয় ।

### শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী ও তাঁর অনুসারীগণ

বর্তমানে যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস নামে পরিচয় দেয় এবং মাযহাব মানার বিরোধিতা করে তারা ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী প্রমুখের নাম সবচে' বেশি উচ্চারণ করে থাকে। ইতিপূর্বে মাযহাব প্রসঙ্গে এই তিনও ইমামের মত আমরা উল্লেখ করেছি এবং আমরা দেখেছি, তারা সবাই মাযহাবপন্থী ছিলেন, শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর সন্তান ও জানশীন (স্থলাভিষিক্ত) আলেম লিখেছেন, 'আমরা ফিকহী মাসআলায় হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। চার ইমামের কোনো এক ইমামের অনুসারী কারো প্রতি আমরা কটুক্তি করি না এবং আমরা এর বাইরের কোনো মাযহাবও অনুসরণ করতে দিই না। কারণ ওগুলো সংরক্ষিত নেই। আর রাফেজী যায়দী ইত্যাদি মাযহাবও ভ্রান্ত। এজন্য এগুলোর উপর আমরা কাউকে থাকতে দিই না। বরং আমরা সকলকে চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করতে বাধ্য করি। (আদ দুরাফুস সানিয়াহ- ১/১৭৭)

প্রশ্ন হলো, যারা তাকলীদকে হারাম শিরক ইত্যাদি বলতে দ্বিধা করেন না, তারা কি এই কথা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী, ইবনে উছাইমীন, সালাহ আল ফাউযান সম্পর্কেও বলতে পারবেন? উম্মতের সকল আলেম-উলামা ও মুহাদ্দিসের বিরুদ্ধে শিরকের অভিযোগ দায়ের করবেন?

হ্যাঁ, উম্মতের সকল আলেমই তাকলীদ করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা বজায় রাখার তাকিদ করেছেন, বাড়াবাড়ি অপছন্দ করেছেন। কিন্তু তাকলীদ পরিত্যাগের মতো অবাস্তব আহ্বান কেউ জানাননি। অনেক খুঁজলে হাজার বছরের ইতিহাসে হাতে গণা দুই/চারজন পাওয়া যাবে যারা বিশেষ কোনো মাযহাব অনুসরণ করতেন না। তাদের কর্মপন্থা হাজারো আলেমের মতের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং সাধারণ মানুষকে তাকলীদ পরিত্যাগের দাওয়াত দেওয়া একটি নতুন এবং অবাঞ্ছিত কাজ, পূর্বকালে যার কোনো নজির নেই।

### আহলে হাদীস ভায়েরাও তাকলীদ করে!

যার ভিতর বিন্দু পরিমাণ ইনসাফ আছে, সেও স্বীকার করবে, আহলে হাদীস আলেমরা তাদের জনসাধারণকে দিয়ে তাকলীদ করায়। কোরআন-হাদীস থেকে একজন নিরক্ষর পানবিক্রেতা আহলে হাদীস, কিংবা সাধারণ শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি প্রতিদিনের অসংখ্য দ্বীনী মাসআলার একটিও তো নিজে নিজে বের করতে সক্ষম নয়। তবে সে আমল করে কিভাবে? ইমামগণের মতসমূহ থেকে অগ্রগণ্য মত বাছাই করার সামর্থ্য কি তার আছে? তাহলে সে কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণ কিভাবে করে? অর্থাৎ সে তার পছন্দের কোনো আহলে হাদীস আলেমের কথা মতো আমল করে। (মাওলানা সাহেব হয়তো অনুগ্রহ করে একটি দলিল ও তার তরজমা বলে দেন। কিন্তু সে নিজে দলিল বুঝে না, তরজমাটা সঠিক কি না তাও জানে না!) বলুন তাহলে, মাযহাব না মানার কী অর্থ? তাকলীদকে শিরক বলার মানে কী?

চিন্তা করুন পাঠক! পূর্বকার মহান ইমামগণের সিদ্ধান্ত- যা হাজার বছর যাবৎ লাখে আলেম-উলামার যাচাই বাছাইয়ে উত্তীর্ণ, তার অনুসরণ ভালো না কি এই যামানার আহলে হাদীস আলেমদের কথা শোনা ভালো? দুই তাকলীদের মধ্যে পার্থক্যটা ধরতে পেরেছেন? আমাদের তাকলীদ এত ঘৃণ্য হলে তাদের তাকলীদ কেন এত উপাদেয়?



### মাযহাব মানার শক্তিশালী দলিল

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম ইনসাফ ও ভারসাম্যের সাথে চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব অনুসরণে বাধা দেননি। সুতরাং আজ যারা বাধা দিচ্ছে, তারা পূর্ববর্তী সকল আলেমের বিরুদ্ধাচারী। এমনকি ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, একই ধারার আলেম ইবনে কাছীর, যাহাবী, ইবনে রজব, ইবনু আব্দিল হাদী এবং শেষ যামানার মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদীসহ সর্বস্তরের আলেমের কর্মপন্থা ত্যাগী। তবে কি বলতে চান, এরা কেউ দ্বীন বুঝেননি এবং এমন জিনিসকে তারা জায়েয মনে করেছেন, যা হারাম এবং শিরক! সুতরাং পূর্ববর্তী সকল আলেম ও সাধারণ মুসলমান মুশরিক! সুবহানাল্লাহ! এর চেে জঘন্য মনোবৃত্তি আর কী হতে পারে! আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন।

### নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের একটি রহস্য

সাধারণ মানুষকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার জন্য এক অঞ্চলে এক মাযহাব মতো আমল করা একান্ত কাম্য। দ্বিতীয় কোনো সঠিক মতও সেখানে প্রকাশ না করা একান্ত কর্তব্য। কারণ মানুষ একটি আমলে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর নতুন আমল দেখলে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তাে সাধারণ মানুষের মাঝে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার বড় প্রয়োজন সামনে রেখে সঠিক হওয়ার পরও ভিন্ন মাযহাবের প্রকাশ ও প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। একারণেই উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. মদিনায় আসলে তথাকার প্রচলিত মাযহাব অনুসারে বিচার করতেন। আবার সিরিয়া গেলে সেখানকার মতানুসারে ফায়সালা করতেন। কিন্তু এক এলাকার মাযহাব অন্য এলাকার লোকদের উপর চাপিয়ে দিতেন না।

(কুরাইশরা কাবা শরীফকে হযরত ইবরাহীম আ.-এর নকশা থেকে ছোট করে পুনঃনির্মাণ করেছিলো। নবীজী সা. একবার আয়শা সিদ্দীকা রা.-কে বলেন, ‘আমার ইচ্ছে হয় কাবা শরীফকে ইবরাহীম আ. এর নকশা মতো পুনঃনির্মাণ করি। কিন্তু কুরাইশ নওমুসলিমরা বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে বলে আমি তা করছি না।’ -সহীহ বোখারী, ১২৬) -এ থেকে বোঝা গেলো, মুসলিম মিল্লাতের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে একটি সাধারণ উত্তম কাজও স্থগিত রাখা জরুরি।

### সাধারণ মানুষের উপর স্থানীয় আলেমদের তাকলীদ করা জরুরি

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর অনুসারী, সৌদি আরবের সর্বজনমান্য আলেম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালাহ আল-উছাইমীন অনেকবার বলেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য আপন অঞ্চলের আলেমদের মাযহাবই মানা উচিত। কেউ যদি বলে, যখন যে ধারার আলেমকে ভালো লাগবে তার অনুসরণ করবো, এতে দোষের কী আছে? শায়খ বলেন, ‘না, আপনার জন্য এমনটা করার সুযোগ নেই। কারণ আপনার উপর জরুরি কেবল তাকলীদ করা। আপনার পক্ষ হতে তাকলীদের অধিক হকদার হচ্ছেন আপনার এলাকার আলেমগণ। আপনি যদি আপন আলেমদের ছেড়ে অপর আলেমদের তাকলীদ করেন, তাহলে



ফেতনা সৃষ্টি হবে। অথচ (আপন দেশের আলেমদের ছেড়ে) অপর দেশের আলেমদের অনুসরণে আপনার কাছে কোনো শরঈ দলিল নেই। (সুতরাং যে বিষয়ে শরঈ দলিল নেই, উপরন্তু তা ফেতনা সৃষ্টিরও কারণ, এমন কাজ কি শুধু আপনার ভালো লাগা না লাগার ভিত্তিতে অনুমোদিত হতে পারে? প্রিয় পাঠক একটু ভেবে দেখুন!) এজন্যই সাধারণ মানুষের উপর আপন এলাকার নির্ভরযোগ্য আলেমদের তাকলীদ করা জরুরি। আমাদের শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দীও এ-মতের জোর সমর্থক। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকার আলেমদের অনুসরণ করার অনুমতি নেই। কারণ এতে করে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমাদের এলাকার কেউ যদি উটের গোশত খেয়ে বলে যে, আমি ইরাকের মাযহাব অনুসারে অযু করবো না, (অথচ তার এলাকার আলেমদের মাযহাব অনুযায়ী উটের গোশত খেলে অজু করা আবশ্যিক) তাহলে আমরা তাকে বলবো, এমনটা করার সুযোগ নেই। তোমার উপর অযু ওয়াজিব। কারণ তোমার এলাকার হাম্বলী মাযহাব অনুসারী আলেমদের মত এটাই। আর তুমি তো তোমার এলাকার আলেমদের অনুসারী!' (লিকাআ-তুল বাবিল মাফতুহ ৩২/১৯)

প্রিয় পাঠক! উপরের উদ্ধৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন। মাযহাব বিরোধী ভায়েরা ভেবে দেখুন, আপনারা তো এতদ অঞ্চলের আলেমদের গোড়া, মাযহাবের অন্ধ অনুসারী এমনকি মুশরিক বলতেও লজ্জাবোধ করেন না। আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আরবের এই সমস্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমদের পরামর্শগুলো ভেবে দেখুন। যেখানে হানাফী মাযহাব সমাদৃত, সেখানকার মানুষকে আরবের আলেমদের অনুসরণ করতে বলা এবং মাযহাব বিরোধী আলেমদের কথা মানতে দাওয়াত দেয়া কতটা অপরিণামদর্শিতা তা একটু চিন্তা করুন।

আমাদের সময়ে তো মসজিদে মসজিদে হাসামা শুরু হয়ে গেছে। একে অপরকে গালিগালাজ করতেও ছাড়া হচ্ছে না। হিংসা-বিদ্বেষের বিষ-বাষ্প আমাদের পরিবেশকে চূড়ান্তরূপে বিষাক্ত করে ফেলেছে। পারস্পরিক মিল-মোহাব্বত যেন চিরতরে বিদায় হয়ে যাচ্ছে। শায়খ উছাইমীন রহ. উম্মতের এই দুর্দশা দেখেননি। এ অবস্থা যদি দেখতেন তবে না জানি কী বলতেন!

### আহলে-হাদীস ভাইদের আচরণ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

তাওসীফুর রহমান গালিব নামের একজন 'লা-মাযহাবী' (কোরআন-হাদীস অনুসরণের সুনির্দিষ্ট পথহীন) ভাই মাযহাবপন্থী আলেমদের ব্যাপারে লিখেছেন, 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোকাবেলায় যারা পীর-ফকীর ও ইমামদের অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানায়, তাদের পিছনে নামায পড়া হারাম। আহলুস সুন্নাহর (?) ইমামগণ এদেরকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী-কাফের) আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব বলেছেন।'

প্রিয় পাঠক! এবার তবে চিন্তা করুন, উম্মতের অধিকাংশ মানুষকে কাফের বলা হলো খারেজীদের স্বভাব। যারা খুবই ইবাদতগুজার ছিলো। কিন্তু তারা হযরত আলী ও মোয়াবিয়াসহ প্রায় সকল সাহাবীকে কফের বলতো। এ-কারণে উম্মতের সর্বসম্মত মত অনুসারে তারা পথদ্রষ্ট-গোমরাহ। আমাদের কালে এই নামধারী আহলে হাদীস ভায়েরা কি তবে সেই উগ্রপন্থী খারেজীদের পথেই হাটছেন! এতটা পক্ষপাতদুষ্ট ঘৃণা-

অন্ধ-উগ্র মানসিকতা কী করে এই ভাইদের ভেতর জন্ম নিতে পারলো তা আমাদের বুঝে আসে না। উম্মতের অধিকাংশ মুসলমানকে যারা কাফের মনে করে, এমনকি এই উম্মতকে হত্যা করে ফেলার জঘন্য মনোবৃত্তি লালন করে, তাদের কাছে ইসলাম ও মুসলমানের কোন কল্যাণটা আশা করা যায়?

আরবে এই ঘরানার লোকদের ‘জামাতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ’ (সকলকে কাফের আখ্যায়িতকারী এবং সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারী দল) বলা হয়। এরা সমস্ত মুসলমানের বিরুদ্ধে হত্যা, যুদ্ধ ও সম্ভ্রাস চালানোকে বৈধ মনে করে। চরম বিদ্বেষপূর্ণ উস্কানিমূলক বই-পুস্তক ও লিফলেট ব্যাপকভাবে প্রচার করে। আল্লাহ পাক এই ভাইদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

### আহলে-হাদীস ফেতনার বড় ক্ষতি

আমরা সবাই জানি, আজ পশ্চিমা সংস্কৃতির ঈমান-বিধবৎসী সয়লাব চলছে চারদিকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভেসে যাচ্ছে এই সয়লাবে। এখনকার মূল কাজ ছিলো সর্বসম্মত বিষয়ে দাওয়াত দেওয়া। ঈমানী যিন্দেগী ও আখেরাত-মুখী জীবন গঠনে তৎপর হওয়া। কিন্তু আহলে হাদীস ভাইদের মাযহাব-বিরোধী অবস্থান এবং উলামা-বিরোধী অপপ্রচারের কারণে সাধারণ মানুষ আলেমদের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ছে, এমনকি আলেমদের প্রতি কু-ধারণা ও বিদ্বেষ পোষণও স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ফলে দ্বীনের মৌলিক তালীম ও তাবলীগ, মানুষের ঈমান-ইসলাম গঠন এবং ইবাদত ও তাকওয়ার পথে আহ্বানের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই মতবাদে যে-ই প্রভাবিত হচ্ছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার ঈমান-আমল আগের চেও নীচে নেমে যাচ্ছে।

আফসোস! আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, হারাম থেকে বাঁচা, শরীয়তের পাবন্দী করা, দোয়া-যিকির ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি মনোযোগী হওয়ার দাওয়াত এখন গুরুত্বহীন। লা-মাযহাবী ভায়েরা যদি দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে গুরুত্তারোপ করতেন, তাহলে নিজেদের অপতৎপরতার ক্ষতিটা ধরতে পারতেন।

### একটি দরদী আহ্বান

আহলে হাদীস ভাইদের খেদমতে পূর্ণ দরদমন্দীর সাথে আরজ করছি, আপনারা জানেন, দ্বীনের যে বিষয়টি স্বাভাবিক কারণেই হালাল, সেটিকে ভুল ব্যাখ্যা করে হারাম আখ্যায়িত করা মারাত্মক গুনাহ ও পাপ। আল্লাহর ওয়াস্তে উম্মতের প্রায় সকল আলেম যে বিষয়টিকে হালাল বলেছেন, আপনার সেটাকে হারাম করতে যাবেন না।

মাযহাব মানা, তাকলীদ করা ইত্তেবা করা একই মর্মের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ। আপনারা সরাসরি কোরআন-হাদীসের এত্তেবার নামে দ্বীনের এমন একটি বিষয় অস্বীকার করছেন এবং তা নিয়ে এত বেশি মাতামাতি করছেন, যা ইতিপূর্বের গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম করেননি। ইসলামের ইতিহাসে একদম নতুন পূর্বভিত্তিহীন একটি দাবী নিয়ে এভাবে ধর্মীয় অঙ্গনে অরাজকতা সৃষ্টি করার দ্বারা দ্বীনের কোন মঙ্গলটা হবে একটু ভেবে দেখুন।

দলকানা হওয়া এবং পার্টি-সাম্প্রদায়িকতা কঠিনতম ব্যধির অন্তর্ভুক্ত। দ্বীনের কল্যাণ হোক বা না হোক নিজ গ্রুপের স্বার্থ-রক্ষা হতেই হবে। এটা জঘন্য অপরাধ। আজ ইনসাফ ও বিবেকের সব দাবীই দলাদলির দেয়ালে মাথা ঠুকরে ফিরে আসছে। ইসলাম ও মুসলমানের সামনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি, তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, শয়তানি সংস্কৃতির সয়লাব কিভাবে ঠেকানো যাবে, মানুষের মাঝ থেকে বস্ত্রবাদ-দুনিয়ামুখিতা, ধোকা-প্রতারণা ইত্যাদি কিভাবে দূর করা যাবে, তা নিয়ে কাজ করা এখন সময়ের দাবি। রাজনৈতিক হেনস্থা থেকে মুক্তি, নাস্তিক্যবাদ থেকে মানুষের ঈমান হেফাজত এবং ধর্মাস্তরের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু আমরা শাখাগত উত্তম আর অধিক উত্তম নিয়ে আত্মহননের আয়োজন করে যাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট:

### সাধারণ মুসলিম ভাই ও বোনদের প্রতি আহ্বান

১. আপনার কাছে কেউ উলামা-মাশায়েখের আমলের বিপরীত কোনো নতুন দাওয়াত নিয়ে এলে বলুন, আমরা সাধারণ মানুষ, কোরআন-হাদীস যাচাই করে ঠিক-বেঠিক নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তোমাদের নতুন দাওয়াত মানতে হলে তোমাদের উপর নির্ভর করেই মানতে হবে, তাহলে উলামা-মাশায়েখের উপর নির্ভর করতে সমস্যা কোথায়?

২. নতুন পথে আহ্বানকারীদেরকে হেকমতের সাথে কোনো প্রাজ্ঞ আলেমের কাছে নিয়ে আসুন। তাকে বলুন, বহুকাল থেকে আমরা যাদের অনুসরণ করে আসছি, তাদের কাছ থেকে আপনি আপনার মত মানিয়ে আনুন, আমরা আপনার ব্যাখ্যা মেনে নিবো।

৩. একটি মোটা কথা চিন্তা করুন, হাদীসের সংকলন-গবেষণা ও পঠন-পাঠনে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরাই হাদীস-বিরোধী বলে অভিযুক্ত হবেন? হাজার বছর ধরে বড় বড় ইমাম, মুহাদ্দিস, আলেম-ফকীহ এবং অলী-বুয়ুর্গসহ অধিকাংশ মুসলমান নামাযের মতো সর্বজনবিদিত ইবাদতে অন্তত দৈনিক পাঁচ বার সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছেন, এটা কোনো বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব কথা হলো? যাদের আল্লাহ-ভীতি, সুন্নাহর প্রতি ভালোবাসা এবং দ্বীনের প্রতি কল্যাণকামিতা প্রশ্নাতীত, তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কি বিবেকসম্মত?!

৪. আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্নতা ও তাঁদের প্রতি অনাস্থা সকল গোমরাহির মূল। এজন্য সাধারণ মানুষকে আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তাঁদের প্রতি আস্থাহীন করে তোলা সকল বাতিলপন্থীর প্রথম টার্গেট। সুতরাং আলেমগণের প্রতি আস্থা রাখুন। তাঁদের কর্মপন্থার বিপরীত নতুন বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

৫. হেদায়েত লাভের আশা নিয়ে কোনো যোগ্য আলেমের তত্ত্বাবধানে কোরআন-হাদীস পড়ুন। সাধারণ ভাইদের পক্ষে গবেষণা করা বা ফতোয়া দানের উদ্দেশ্য নিয়ে অনুবাদ পড়া অনধিকার চর্চার শামিল, এ থেকে বিরত থাকুন।

৬. আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমরা তো একটি অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করতেও অক্ষম। সুতরাং আমাদের জন্য কারো অনুবাদ পড়ে হঠাৎ করেই এযাবৎ কালের সকল আলেম-উলামার কর্মপন্থা ত্যাগ করে নতুন কর্মপন্থা অনুসরণে লেগে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। আমরা এমন নির্বুদ্ধিতা থেকে নিজেদের অবশ্যই রক্ষা করবো।

### আহলে হাদীস ভাইদের প্রতি আহ্বান

১. পারস্পারিক হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়াঝাটি সর্বসম্মতভাবে হারাম, আমরা এ থেকে বিরত হই। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও কল্যাণকামিতার মানসিকতা নিয়ে আসুন আমরা (আলেমরা) ইলমী আলোচনায় অংশ নিই।

২. আহলে হাদীস আলেমগণের প্রতি অনুরোধ, এক তরফা, খতি ও অপূর্ণাঙ্গ পড়াশোনা দয়া করে পরিহার করুন। নিজেদের বই-পুস্তকের পাশাপাশি মুক্ত মনে অপর মতের কিতাবাদিও অধ্যয়ন করুন।

৩. বেনামাযীদের নামাযী বানানোর চেষ্টায় অংশ নিন। মিশনারি ফেতনা ও কাদিয়ানি অপতৎপরতা প্রতিরোধে উদ্যোগী হোন। পশ্চিমা সংস্কৃতির মোকাবেলা ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন।

৪. আপনারা জানেন, দ্বীনের অকাউন্ট, মৌলিক ও সর্বসম্মত বিষয়গুলোই কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী দাওয়াতের বিষয়। দলিলসম্মত মতপার্থক্যকে সাহাবা-তাবেঈ কেউ-ই দাওয়াতের বিষয়বস্তু বানাননি। সুতরাং দলিলসম্মত মতপার্থক্যকে দাওয়াতের বিষয়বস্তু বানিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করা সুন্নাহ-বিরোধী কাজ। এ থেকে বিরত থাকুন। আর কেবল বিদআতের মোকাবেলায় সুন্নাহর আহ্বান হয়, একটি সুন্নাহর মোকাবেলায় আরেকটি সুন্নাহর আহ্বান সাহাবায়ে কেরামের নীতির সম্পূর্ণ খেলাফ।

৫. হাদীসে রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা যেমন আছে না করার কথাও আছে, উভয় দিকে সাহাবীগণের আমল আছে। সুতরাং একটির প্রতি বিরাগভাজন হয়ে অন্যটি গ্রহণ করা, অন্যটির অনুসারীদেরকে বিরক্ত করে এক সুন্নাহ দ্বারা অন্য সুন্নাহকে বাতিল করা চরম অন্যায়-অদ্ভুত কাজ। এমন কাজ পরিহার করুন।

### মসজিদের ইমাম ও খতিবগণের প্রতি বিনীত আবেদন

‘মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ প্রত্যেক মহল্লার দ্বীনী যিম্মাদার। ইতিবাচক কাজের পাশাপাশি হেকমতের সাথে সকল ফেতনার মোকাবেলা করাও তাদের বড় দায়িত্ব। এর জন্য কিছু প্রস্তুতিও নেয়া আবশ্যিক। যেমন,

১. মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলার দলিল ভালোভাবে বুঝে নেওয়া এবং যেহেতু হাজির রাখা।

২. সাধারণ মুসল্লিদের সামনে তা সহজ ও বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা।

৩. পূর্বের যামানায় আহলুল হাদীস মানে ছিলো হাদীস-বিশারদ মুহাদ্দিস, যারা সদাসর্বদা হাদীসের চর্চা-গবেষণায় নিরত থাকতেন। তাঁরা ইজমা এবং কিয়াসকেও শরীয়তের দলিল বলে গণ্য করতেন। কিন্তু

বর্তমানে হাদীস চর্চা করুক বা না করুক, যে মাযহাবের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের মন মতো হাদীস মানে, ইজমা-কিয়াস অস্বীকার করে, বিভিন্ন মাসআলায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা-আমলের বিরোধিতা করে সে-ই আহলে হাদীস!

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘উগলূতা-ত’ করতে (উল্টাপাল্টা অবাস্তর প্রশ্ন করে কাউকে পেরেশানিতে ফেলে দিতে) নিষেধ করেছেন। আহলে হাদীস ভায়েরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারীদেরকে ‘উগলূতা-ত’-এর মাধ্যমে পেরেশান করে থাকে। আপনি তাদের ‘উগলূতা-ত’ সম্পর্কে সজাগ থাকুন। যেমন তারা প্রশ্ন করে, নবীযুগে কি চার মাযহাব হানাফী মালেকী ইত্যাদি ছিলো? আপনি বলুন, সিহাহ সিভাহ- সহীহ বোখারী সহীহ মুসলিম ইত্যাদি কি নবীযুগে ছিলো? আসলে হাদীস তো নবীযুগেরই, সংকলনের হিসাবে বলা হয় সিহাহ সিভাহ- সহীহ বোখারী সহীহ মুসলিম। ঠিক তেমনি মাযহাব ও ফিকহ নবীযুগ থেকে ছিলো। তবে সংকলনের হিসাবে বলা হয় চার মাযহাব- হানাফী মালেকী ইত্যাদি।

কখনো তারা প্রশ্ন করে ফিকহ মানেন না কি হাদীস মানেন? আপনি বলুন, ফিকহ মানা এবং হাদীস মানা একই কথা। কারণ ফিকহ তো হাদীসে বর্ণিত মাসআলারই সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত সংকলন! আর ফিকহ মানাই হাদীস মানার সরল পথ।

অনেক সময় প্রশ্ন করে, আপনি মুসলমান না হানাফী! আপনি বলুন, আপনি ফরিদপুরী না বাংলাদেশী? অর্থাৎ যে ফরিদপুরী সে অবশ্যই বাংলাদেশী। দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তেমনি যিনি হানাফী তিনি অবশ্যই মুসলমান। এদুয়ের মধ্যেও কোনো বিরোধ নেই। -যাইহোক তাদের এজাতীয় ‘উগলূতা-ত’-এর ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকুন।

৫. দলিলসমৃদ্ধ নির্ভযোগ্য পুস্তিকা মুসল্লিদের হাতে হাতে পৌঁছে দিন।